শিল্পে সংগীত ও সৌন্দর্য

প্রিয়াংকা গোপ*

সারসংক্ষেপ

মানবমনের উৎকর্ষ সাধনে সংগীত অনবদ্য একটি মাধ্যম। ভারতীয় উপমহাদেশের সুরের গভীরতা পরিমাপ করা যায় শাস্ত্রীয় সংগীত শুনলে। মূল ভূখণ্ড ভাগ হয়ে গেলেও উপমহাদেশীয় অধিকাংশ অঞ্চলেই ভারতীয় সুরের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বাংলাদেশে মুখ্যত উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চিত হয়। বর্তমানকালের শাস্ত্রীয় সংগীত এককালের অভিজাত দেশি সংগীত, যা গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত নয়। গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত হল বৈদিক যুগের গান, যা বর্তমানকালে বিলুপ্ত। উচ্চাঙ্গ সংগীত বা শাস্ত্রীয় সংগীত মূলত রাগনির্ভর, তাই একে রাগসংগীতও বলা হয়। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত বা হিন্দুস্থানি সংগীতে মূল তিনটি গীতধারা অর্থাৎ ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরি স্বীকৃত। মাধ্যম ও গীতরীতিভেদে একই রাগ স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। সংগীতশিল্পী আনন্দোপলব্ধির খোঁজ সবসময় সুরের মধ্যেই করেন। একই সুর কণ্ঠভেদে এমনকি একই শিল্পীর কণ্ঠে ভিন্ন সময়ে মাঝে মাঝে শাস্ত্রের সীমানা ছাড়িয়ে নান্দনিক হয়ে ওঠে। এর ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। বৈচিত্র্যময়তাই রাগসংগীতকে রহস্যময় করে তুলেছে। গায়কের সৃজনক্ষমতা ও শিল্পবোধের সঠিক প্রকাশের মাধ্যমে রাগসংগীতে সুরের নিজস্ব যে রং ও গভীরতা রয়েছে তার রূপায়ণ সম্ভব হয়। এই ভাবরূপায়ণই সাধারণ মানের গায়ক/গায়িকাকে শিল্পী হিসেবে এবং শাস্ত্রীয় সংগীতকে নান্দনিকতার পর্যায়ে উন্নীত করে। ফলে সাধারণ একটি রাগ শিল্পীর কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাণবন্ত এই বিমূর্ত রাগ সুরের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করে। শিল্পে এই সৌন্দর্যের যে রসাস্বাদন হয় তারই ব্যাখ্যা দেয় সৌন্দর্যশাস্ত্র। রাগ বিমূর্ত হলেও এর একটা প্রচ্ছন্ন রূপ রয়েছে, যার সঠিক রূপায়ণে শিল্পী পারমার্থিক আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দ শিল্পীর সৃষ্টি ও তা থেকে উদ্ভূত আত্মানন্দ থেকে জন্ম নেয়। তাইতো শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সংগীত সর্বোৎকৃষ্ট।

যে কথা ভাষায় সঠিকভাবে ব্যক্ত করা যায় না সেখানে অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য সুরের প্রয়োজন পড়ে; এককথায় বলতে গেলে যেখানে কথার শেষ সেখানে সংগীতের শুরু।

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থাৎ মনের যে অভিব্যক্তি ভাষায় বোঝানো যায় না সংগীত তা অনায়াসে বুঝিয়ে দিতে পারে, এমনকি নতুন করে অনেক কিছু ভাবতেও শেখায়। ভাব প্রকাশের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল সংগীত। না বলা অনেক কথা, না দেখা অনেক ছবি সংগীতের মাধ্যমেই নিজস্ব রঙে অনুভব করা যায়। এই সংগীত বিমূর্ত, উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীতে ভাব প্রকাশক আলাদা ভাষা নেই বা থাকলেও তার প্রভাব সুরের মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ উচ্চাঙ্গসংগীত হল সুরসর্বস্ব। এর সাহায্যে মানুষ শুধু বিনোদনই পায় না, নিজেকে আবিষ্কার করতেও শেখে। নিজেকে নতুনরূপে আবিষ্কার করার আনন্দে মনের ভেতরের গ্রন্থিগুলো আবেগে অনুরণিত হতে থাকে। শাখাভেদে শিল্পবিচার ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু একই থাকে। ফলে শিল্পবিচার নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকাশ পরবর্তী পদক্ষেপ হল শিল্পবিচার।

সংগীত ও শিল্পবিচার

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হল অনুকরণ, সুর আর ছন্দবোধ। এর পরিশীলিত রূপই পরবর্তীতে শিল্পের জন্ম দিয়েছে। শিল্পে আপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনশীলতা আছে বলেই শিল্পবিচারে শিল্পের বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োগ প্রয়োজন। শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাতে বাস্তবের অনুকরণের কথা বলা হয়েছে, যা সংগীতে স্পষ্টত নেই। অনেকে বলেন সংগীতের স্বর বা রাগরাগিণী প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট। কিন্তু প্রকৃতিতে দৃশ্যমান কোনো কিছু থেকে স্বরের উৎপত্তি হয়েছে এমন কোনো শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। আদিমকালে সাতটি স্বরের উৎসস্থল হিসেবে হাতির ডাক, ঘোড়ার ডাক, ময়ূরের ডাক, গাভীর ডাক, ক্রৌঞ্চের ডাক, ছাগের ডাক ও পিকের ডাক-কে বলা হত। কিন্তু সকল ঘোড়ার ডাক বা হাতির ডাকের উচ্চতা বা অনুরণন এক হয় না। ফলে ওইরকম বেসুরো ডাক থেকে একটা স্বরের জন্ম হতে পারে, এমনটা ভাবা অবাস্তব এবং এতে কোনো ধরনের সাযুজ্যও লক্ষ করা যায় না। আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীতে যে বারোটি স্বর আছে পাশ্চাত্যেও সেইরকম বারোটি স্কেল রয়েছে। মূলত ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরের উৎসস্থল হিসেবে ধরা হয় ময়ুর, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির ডাক। তাহলে পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের স্কেল এক হল কী করে? কে কাকে অনুসরণ করেছে? পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকেরাও কি স্বরের উৎসস্থল হিসেবে পশু পাখির ডাককেই প্রাধান্য দিয়েছেন? তা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে মূল বিষয়টি এক হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। স্বরের সাথে স্বরের মিলন হয়ে যে সুরের মালা তৈরি হয় তার সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মেলানোর চেষ্টা করেন শিল্পী ও শ্রোতারা; তবে সেটা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ বলা যায় প্রকৃতি থেকে সরাসরি কিছুর অনুকরণ না হলেও সংগীত মূলত প্রকৃতিরই বিষয়; কেননা এই সুরের সৌন্দর্য প্রকৃতির বিভিন্ন সময়ের সৌন্দর্যানুভূতি মনের মধ্যে তুলে আনে। একে রূপসৃষ্টি বলা যায়। রূপের নির্যাস হল রস। নিরাকার রূপের মধ্য থেকে যে

রস নিঃসৃত হয় তাকে নিজস্ব মেধা ও সৃজনশীলতা দিয়ে আয়ত্ত করাই সংগীতশিল্পীর কাজ। এই রসের স্বাদ যখন শ্রোতারা পায় তখন শিল্পের সেই বিশ্লেষণ সংগীতের নান্দনিকতা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কেননা যা থেকে আনন্দ লাভ হয় অথবা যার দ্বারা আনন্দ দান করা যায় সেটাই নন্দন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীতের শৈল্পিক বিশ্লেষণে মতের মিল থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে মতভেদ আছে। পশ্চিমা সংগীত বিশ্বের সমস্তকে নিয়ে কথা বলে এবং এর বড় সৌন্দর্য সমবেতভাবে শিল্পীদের হারমনি। প্রাচ্যের সংগীত এক-কে নিয়ে কথা বলে এবং এর বড় সৌন্দর্য চলাচলের জায়গা, যা নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও শিল্পী ঐ সীমার মধ্যেই নিজস্ব ঢং তৈরি করে নতুন একটি রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। পাশ্চাত্যের গানে সুরের ওঠানামা বেশি, এর গতিময়তা মনে উদ্দীপনা জাগায়। অপরদিকে প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় সংগীত গভীরতায় নিমজ্জিত, এর গতি অপেক্ষাকৃত কম ও বিস্তৃতি বেশি যা মনকে শান্ত করে। এ থেকে বোঝা যায় পাশ্চাত্যের ক্লাসিক্যাল মিউজিক ও ভারতীয় উপমহাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত এক নয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের গানগুলিকে ক্লাসিক গান বলা হয় এবং ভারতবর্ষে শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে যে সংগীত তাকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলা হয়। সব থেকে বড় কথা বিশ্বের সমস্ত সংগীতই মনের উত্তেজনা (অত্যধিক আনন্দ বা গভীর বেদনা) প্রশমিত করার মহৌষধ। জীবন চালাতে নয়, জীবনকে উপভোগ করতে শিল্পচর্চার বিকল্প নেই। (ঠাকুর, ১৩৯২)

শিল্প গতিশীল ও পরিবর্তনশীল ফলে এর বিচারও আপেক্ষিক। বর্তমানে যে বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, ভবিষ্যতে সেই ধারণা পরিবর্তিতও হতে পারে। আগে যেমন রাগের একরকম রূপায়ণ হতো এবং শ্রোতার কাছে ভালোও লাগত, বর্তমানে গাওয়ার সেই ভঙ্গিই পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং সময়ের বিচারে আধুনিক শ্রোতাদের কাছেও শাস্ত্রীয় সংগীত ভালো লাগে। এই সময়ে কেউ পুরাতন গায়কি অনুকরণ বা অনুসরণ করলে তা কতটুকু শিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ হবে তা চিন্তাসাপেক্ষ।

নন্দনতাত্ত্বিকেরা শিল্পের আরেকটি শ্রেণিকরণ করেছেন, যার নাম ললিতকলা। এই ললিতকলাবিদ্যার দুটি দিক। বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক। বাইরের দিকটি হলো রূপ যা দেখে প্রাথমিকভাবে আমরা আকৃষ্ট হই আর ভেতরের দিকটি হলো রস, যাকে শুধুমাত্র অনুধাবন বা অনুভব করা যায়। এই রূপ ও রসের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেটাই আর্ট। রূপকে আধার করেই রস বিস্তার লাভ করে। শুধু রূপ শিল্প নয়, বাস্তবতাও বটে। যখনই রূপ-রস একত্রে মিশে যাবে তখন বাস্তবতা থেকে শিল্পের পর্যায়ে উপনীত হবে। প্রাণহীন দেহকে রসহীন রূপের সাথে তুলনা করা যায়, যার বোধ নেই এবং সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে নবরসের কথা উল্লেখ আছে তা কেবল নাট্যের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কেবল শৃঙ্গার ও শান্ত রস প্রযোজ্য। কেননা এই উপমহাদেশের সুর একের দিকে কেন্দ্রীভূত, যা গভীর ও শান্ত। প্রেম– সেও গভীর, বিরহ– সেও গভীর। এই গভীরকে অনুধাবন করাই আসল। এই ভূমার সুর এতটাই গভীর, যার তল স্পর্শ করা যায় না। এ থেকে নিঃসৃত রস শেষ হবার নয়। ছোঁয়াচে রোগের মত কেবল এক থেকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আনন্দময় সংগীত শ্রবণের পর কোন রাগ, কী তার বাণী কোনটাই মনে সঞ্চিত থাকে না। পরিবেশনা শেষে রাগের অন্তঃস্থিত গভীর রসই আচ্ছন্ন করে রাখে সারাক্ষণ।

"ক্রোচের মতে- প্রকৃতি আর্টের তুলনায় মূঢ়। প্রকৃতি নিজ থেকে কোন কথা বলে না। মানুষ যখন তাকে বলাতে বাধ্য করে তখনই সে মুখর হয়ে ওঠে।"(উদ্ধৃত: রহমান, ১ম, ২০১৪: ৪৫) প্রকৃতি শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন করে মাত্র। মানুষ তাকে নিজের মত করে আপন করে নেয় এবং অন্যের সামনে উপস্থাপন করে। শ্রী শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৩৩৭ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায় *'কান্টের সৌন্দর্যবিচার'* শীর্ষক প্রবন্ধে কান্টের শিল্পে সৌন্দর্যবোধ এবং রসবোধ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

> জার্মান দার্শনিক কান্ট শিল্পের সৌন্দর্য বিচার করেছেন- বুদ্ধির জগৎ ও ব্যবহারিক প্রজ্ঞার জগতের যুগলমিলন দিয়ে। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার প্রবেশাধিকার রয়েছে অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক জগতে, যাতে বুদ্ধির প্রবেশাধিকার নেই। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করে। তাঁর মতে মানবাত্মার তিনটি মৌলিক ধর্ম যথাক্রমে জ্ঞান, সুখ ও ইচ্ছা, যা শিল্পের তিনটি শক্তিকে প্রকাশ করে। জ্ঞান থেকে বুদ্ধি, সুখ থেকে বিচারশক্তি এবং ইচ্ছা থেকে প্রজ্ঞা। তাঁর মতে রসবোধ বিচারশক্তির ওপর নির্ভরশীল। রসবিচারের ক্ষেত্রে তিনি এই দুই জগতের ঐক্যের কথাই বলেছেন। সর্বোপরি আনন্দবোধই কান্টের মতে সৌন্দর্য বিচারের মূল কথা। কারণ, আনন্দবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। আসলে যা আনন্দ দিতে পারে না, তা মানুষের মানসলোককে রসের বন্যায় আপ্লুত করতে পারে না, তার সৌন্দর্যে আমরা অভিভূতও হই না। (উদ্ধৃত: রহমান, ১ম, ২০১৪: ৫০)

ভারতবর্ষে সৌন্দর্য বা নন্দনতত্ত্ব বলতে বোঝায় 'ললিতকলার বিজ্ঞান' ও দর্শন। ললিতকলার বিশুদ্ধ ভাবটি স্ফূরণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পোশাকি রঙ। এই রঙের ব্যবহার করে শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে বিভিন্ন অদৃশ্য চিত্র অংকন করেন, অনেকটা জলছবির মত। যা তৈরি হতেই মিলিয়ে যায়, যা চোখে দেখা যায় না শুধু অনুভব করা যায় মাত্র। সংগীতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন। শিল্প হিসেবে সংগীতকে প্লেটো – ঐশ্বরিক, হেগেল – আনন্দ, ক্রোচে – প্রজ্ঞার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ – সুন্দরের মধ্যে আনন্দের যোগ এবং কান্ট – সৌন্দর্যানুভূতির চরম প্রকাশ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন।

উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত বিমূর্ত শিল্প। বিমূর্তরূপবাদীরা শিল্পের উপাদানসমূহ কীভাবে ব্যবহার করে শিল্প সৃষ্টি করে তার কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু কোনো উপাদান এককভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। অপরদিকে ফর্মালিস্ট বা রীতিনিষ্ঠরা সংগীতে বুদ্ধির ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সর্বোপরি এক্সপ্রেশনিস্ট বা অভিব্যক্তিবাদীরা বোঝাতে চেয়েছেন কীভাবে সংগীত সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার করে এবং তার বিস্তৃতি ঘটায়। মতবাদ যেটাই হোক না কেন প্রত্যেকটি শিল্পমাধ্যমের শিল্প হয়ে উঠতে হলে প্রকাশ অত্যন্ত জরুরি; কেননা শিল্পী যা সৃষ্টি করছে তা কল্পনালোক থেকে সর্বপ্রথম নিজের মধ্যে তাকে প্রকাশ করে যাকে অন্তঃপ্রকাশ বলা হয় পরবর্তীতে বোদ্ধা দর্শক বা শ্রোতার প্রয়োজন যারা শিল্পীর এই প্রকাশকে আরো উচ্চ মাত্রা দান করবে, এই প্রকাশকে বহিঃপ্রকাশ বলা হয়। শিল্পী তার নিজস্ব সৃষ্টির মাধ্যমে যখন সৌন্দর্য সৃষ্টি করবেন তখন সেটা শ্রোতা বা দর্শকের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছালো কিনা সেই মূল্যায়নই শিল্পের বিচার, যা শিল্প হিসেবে উক্ত সৃষ্টিকর্মকে মূল্যায়ন করবে। তবে এদের প্রত্যেকেই রূপের পূজারী। শিল্প মাধ্যমে এক নতুন রূপের সৃষ্টি করেন শিল্পীরা। এদের মধ্যে আরেকটি দল আছে যারা হেডনিস্ট বা ভোগসুখবাদী বলে পরিচিত। তাদের মতে শিল্প হচ্ছে আনন্দের বিষয়বস্তু। সংগীতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল আবেগকে জাগ্রত করা বা আনন্দময় অনুভূতির জন্ম দেয়া। শিল্প মানুষকে আনন্দ দেয় ঠিকই কিন্তু এই আনন্দ ইহজগতের আনন্দ নয়, পারমার্থিক আনন্দ। ইহজাগতিক আনন্দ অর্থে শুধুমাত্র বিনোদন বোঝায়, এর সঙ্গে আত্মিক বোধের সংযুক্তি নেই; কিন্তু পারমার্থিক আনন্দ বলতে আত্মবোধ অর্থাৎ পরমের খোঁজ পাওয়ার আনন্দকে বোঝায়।

শিল্পবিচারের কিছু বিষয়ের অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একজন সত্যিকারের শিল্পরসিকই একজন ভালো শিল্পবিচারক হতে পারেন। এক. একটি বস্তু বা রাগসংগীত কেন শিল্প হিসেবে পদবাচ্য হলো; দুই. কীভাবে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল; তিন. শিল্পবস্তু কোন ভাব বা বিষয়কে রূপায়িত করল। এই বিষয়গুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে বিচার করলে সেই শিল্পের প্রতি সঠিক বিচার হবে বলে আশা করা যায়। শিল্পের সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিল্প সম্বন্ধীয় অনেক অজানা তথ্যই উঠে আসে, যা নান্দনিকতাকে নির্দেশ করে।

শিল্পবিচারে শেষ কথা বলে কিছু নেই, চূড়ান্ত কোনো রায় নেই। বস্তুমাত্রই যেমন শিল্পবস্তু নয়, তেমনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া মাত্রই শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়া নয়। একই রাগকে চারটি ধারায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপায়িত করা যায়, তেমনি শিল্প বিচারকরাও তাদের নিজস্ব ভাবনা দিয়ে শিল্পের বিচার করতে পারেন। ফলে সংগীতের শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

সংগীতে সৌন্দর্যদর্শন

সৌন্দর্যসৃষ্টি ও তা উপভোগ করা সব শিল্পেরই ধর্ম। শিল্প মানেই সুন্দর এমনটা মোটেও সঠিক নয়। শিল্পে সুন্দর ও অসুন্দরের সহাবস্থান রয়েছে; যেমনটি আলো-অন্ধকারের, সুর-অসুরের সহাবস্থান। যদিও অসুন্দর কথাটি সুন্দরের বিপরীতার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়, তথাপি সুন্দরের মত অসুন্দরও সৌন্দর্যের একটি অংশ। শিল্প সৃষ্টির সকল উপাদানের সঠিক সমন্বয় ও ভাবনার সাথে প্রকাশের যথাযথ সঙ্গতি যেমন রূপ সৃষ্টিতে সমর্থ ঠিক তেমনি উপাদানসমূহের সমন্বয়হীনতা ও ভাবের সাথে প্রকাশের অসঙ্গতি অসুন্দরের নির্দেশক। সুন্দরকে সুন্দররূপে প্রতীয়মান করতে অসুন্দরের উপস্থিতির প্রয়োজন পড়ে। তবে হ্যাঁ, সুন্দর ও অসুন্দরের সহাবস্থান বিষয়বস্তুর শিল্পসত্তাকে সামগ্রিকভাবে সুন্দর করে তোলে; সর্বোপরি সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে তোলে। মানুষের মনের তীব্র ঘৃণাবোধ থেকেই অসুন্দর জন্মায়, আর গভীর আনন্দবোধ বা বেদনাবোধ থেকে সৃষ্টি করার স্পৃহা জন্মে। বিভিন্নভাবে ভেতরের আনন্দ বা বেদনাবোধকে বাইরে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় যা সৃষ্টি হয় তাই শিল্প। শাস্ত্রীয় সংগীত সেই বোধের জাগরণ ঘটায়, যা শুনে মনের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায় অথবা বেদনার ভারও হালকা হয়ে যায়, অপরদিকে সৌন্দর্য পিপাসুরা তাই শুনে তৃপ্ত হয়।

সৌন্দর্যবোধ সদা সক্রিয় ও চলমান। "সৌন্দর্য বস্তুতে নেই, আছে মানুষের কর্মকাণ্ডে। সৌন্দর্য কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ নয়, বরং তা প্রতীতির ব্যাপার।" (ইসলাম, ২০০৬: ১৬) সংগীতের অপার সৌন্দর্য এককজনের মনে একেক রকমভাবে ধরা দেয়। এই "সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করে সৌন্দর্যদর্শন অর্থাৎ 'Philosophy of Beauty'।" (রহমান, ১ম, ২০১৪: ১২) মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্য পিপাসু। তবে সৌন্দর্য সবসময় আপেক্ষিক। মানুষভেদে সৌন্দর্য ভিন্নভাবে ধরা দেয়। সৌন্দর্য শিল্পের আখ্যা তখনই পায় যখন শৈল্পিক বা নান্দনিক মন তাকে বিশ্লেষণ করে। প্রশ্ন আসে– সুন্দর কী? যা মনে ভালো লাগে, তাই সুন্দর। "সজ্ঞান বিবেচনার বাইরে আনন্দ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া তাই সৌন্দর্য"। (ইসলাম, ২০০৬: ৮) এর প্রভাবে অপরজনের মন প্রভাবিত ও আন্দোলিত হয়। এই সুন্দর মানবজীবনকেও মহিমান্বিত করে তুলতে সাহায্য করে। "সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর *সৌন্দর্যতত্ত্ব* বইতে বলেছেন– 'সৌন্দর্য একটি বিশেষ সামঞ্জস্য বা পরিচয়ের বোধ'।" (উদ্ধৃত: ইসলাম, ২০০৬: ১১) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সহজে বলেছেন- সুন্দর বলেই সে সুন্দর। তিনি আরও বলেছেন– "যে শিল্পের ভিতরে রসের সন্ধান করে তাহার কাছে স্বর্গও নাই, নরকও নাই, সে দেখে সুন্দরে অসুন্দরে এক মহাসুন্দর বর্তমান।"(উদ্ধৃত: ইসলাম, ২০০৬: ৪০)

কেউ কেউ এই বিষয়টিকে নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু শিল্প তৈরি হয় শিল্পীর অবচেতন মনে এবং তার অবয়ব দান করেন চেতনার দ্বারা। এখানে নৈতিকতাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে জুড়ে দিলে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। শিল্পে নীতি থাকবে কি থাকবে না তা শুধু শিল্পীই নির্বাচন করবেন। কেননা নীতি না থাকলে সেখানে যে অনৈতিক বা দুর্নীতি থাকবে এমন কথা কখনও বলা যায় না। যা থাকতে পারে তা নিছক বিনোদনও হতে পারে। তবে শিল্পী হতে গেলে যে বোধ এবং গুণাবলির দরকার হয় তাতে নিশ্চয়ই অকল্যাণকর কোনো ভাবনা থাকে না। যেমন– কালবৈশাখী ঝড় মুহূর্তেই গোটা পৃথিবীকে তছনছ করে দিতে পারে কিন্তু এই ঝড় একটি বিষয়বস্তু হিসেবে শিল্পীর তুলিতে বা কলমে অথবা কণ্ঠে এক নতুন মাত্রা দিতে পারে এবং এই মাত্রা শিল্পীর অসাধারণ মেধা ও প্রকাশ ক্ষমতার দ্বারা সৌন্দর্যও সৃষ্টি করতে পারে। এখানে কোন নীতি না-ও থাকতে পারে তবে বার্তা থাকতে পারে যা কিনা নান্দনিকতা সৃষ্টির পরিপন্থী নয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে সুন্দরের একটা সীমারেখা আছে, দার্শনিক বা রসিক দৃষ্টিতে সুন্দরের শুরু হয় এই সাধারণের সীমারেখার শেষ থেকে যা অসীমের দিকে ধাবমান। সুন্দরের এই দুটি রূপ নিয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে–

> প্রথমটি আদর্শ সুন্দর, দ্বিতীয়টি চূড়ান্ত সুন্দর। আদর্শ সুন্দর বলতে রূপের একটি বিশেষ প্রকাশকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তি নির্বিশেষে রসবোধ জাগ্রত হয় এবং একটি শান্ত ভাবের জন্ম হয়। চূড়ান্ত সুন্দর বলতে যা বিবেচিত তা বিশ্বাস মাত্র, সত্যে রূপ নিতে পারেনি। আদর্শ সুন্দর আর চূড়ান্ত সুন্দর এক নয়। বলা যায় চূড়ান্ত সুন্দরের একটি কার্যকর অর্জিত রূপ আদর্শ সুন্দর। সাধারণ মানুষ এই আদর্শ সুন্দর পর্যন্ত তাদের নান্দনিক অনুভূতিসমূহকে বিন্যস্ত করতে পারে, এর বাইরে দার্শনিকের জগৎ, ধ্যানের জগৎ। (ইসলাম, ২০০৬: ৪০)

বিভিন্ন দার্শনিকদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আনন্দের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে সেটা সকলেই কম বেশি স্বীকার করেছেন। এই আনন্দ অপ্রত্যাশিত আনন্দ। অন্তরের সুপ্ত একটি বাসনা হঠাৎই ঘুম থেকে জেগে ওঠে কোনো এক সোনার কাঠির (নন্দনবোধ) স্পর্শে। যখন তা স্বমহিমায় প্রকাশিত হয় তখন মনে হয় সত্যিই কি এই বিষয়টি নিয়ে মন ভাবছিল বা ভেবেছিল? "অনাদি সংস্কারবশত অন্তরে সত্যই যে আনন্দস্ফূর্ত হয়, সেটাই সৌন্দর্যের আনন্দ।" (রহমান, ১ম, ২০১৪: ৪০) শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছেন বলা যায়। তাঁর মতে– "আমরা সৌন্দর্য উপভোগ বা উপলব্ধি করি মাত্র, সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করতে পারি না। গোলাপ ফুল, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, অষ্টাদশী যৌবনা কিংবা তারকাখচিত সুনীল আকাশ

ইত্যাদি স্বীয় মহত্ত্বে মোহনীয় এবং মানুষেরা তার পূজারী।" (উদ্ধৃত: রহমান, ১ম, ২০১৪: ৪১) সৌন্দর্যকে তিনি বস্তু বা প্রাণীর মৌলিক ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়– পার্থিব সৌন্দর্যকে শিল্পের পর্যায়ে রাখা চলে না। তাই বলে প্রকৃতি অসুন্দর এমনটা নয়। এসব বিষয় নিজস্ব গুণে গুণান্বিত হলেও কেউ না কেউ এর সৃষ্টি নিশ্চয়ই করেছেন। এ সৃষ্টিকর্তা হলেন পরম করুণাময় ঈশ্বর। প্রকৃতি থেকেই মানুষ শিল্পের রসদ সংগ্রহ করে। তাই মনুষ্যসৃষ্ট সৃজনশীল সৃষ্টিকেই শিল্পের পর্যায়ে রাখা যায়, কেননা তা বিচার-বিশ্লেষণযোগ্য। প্রকৃতি বা ঈশ্বরসৃষ্ট সমস্তকিছু এসব কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি অন্তঃস্থিত সৌন্দর্য দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন আর মনুষ্যকে দিয়েছেন দৃষ্টি ও বুদ্ধি। যে দৃষ্টি শুধু দেখার জন্যই দেননি, সেই দৃষ্টিতে শুধু উপভোগই নয় সেই দৃষ্টিতে অন্য এক সৌন্দর্য উদঘাটিত হয় যা সেই মানুষকে রসিক বা নান্দনিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। দার্শনিক হ্যান্সলিক পার্থিব সৌন্দর্যকে চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে দেখেছেন, সংগীতের নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নিজের মনের সৌন্দর্যের সাথে মিশ্রিত করে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তা-ই শিল্প বা আর্ট। অর্থাৎ মৌলিক যে গুণাবলি নিয়ে প্রকৃতি সৃষ্ট, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং সেই সৌন্দর্যের নির্যাস থেকেই কিন্তু শিল্প রচনার অনুপ্রেরণা পান শিল্পীরা। সৌন্দর্যের কোন মানদণ্ড হয় না বলেই তো শিল্প সর্বজনীন।

নন্দন হলো সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের সমাবেশ। অর্থাৎ সেই শক্তি যিনি বিশ্ব ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দরকে প্রেম বলছেন। যার সবটাই মানুষের প্রতি ও সবশেষে আধ্যাত্মিকতায় নিবেদিত। প্রেম যেমন আপেক্ষিক তেমন সুন্দরও আপেক্ষিক। যে কোনো কিছুর প্রতি প্রেম জাগতে পারে, ভালোলাগাটাই সেখানে মুখ্য, ফলে ভালোলাগার সাপেক্ষে বিষয়বস্তুও সুন্দর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ একথা অগ্রাহ্য করার মত নয় যে, যা প্রেম তাই সুন্দর অথবা যা সুন্দর তাই প্রেম। প্রেম মানে একতরফা ভালোবাসা, যার প্রতিদানে কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকে না। শিল্পের প্রতি সেই প্রেম থাকলেই কেবল আসল সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা অফুরন্ত। এই প্রেমকেই হৃদয়ে ধারণ করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে বলছেন–

> "সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে
> তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ দুখজ্বালা সেই পাসরে
> সব দুখজ্বালা সেই পাসরে।।" (ঠাকুর, ২০০৬: ১২৬)

এ ঈশ্বরের দর্শন সাধুপুরুষ, সাধারণ মানুষ আর শিল্পী প্রত্যেকের চোখেই ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে প্রত্যেকেই ঈশ্বরগামী হতে চান; কেউ চেতন মনে কেউ বা অবচেতন মনে। সাধুরা শাস্ত্রবিধি মেনে, ধর্মীয় আচার মেনে তাদের সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত করেন। অপরদিকে সাধারণ মানুষ শুধু লৌকিকতা

দিয়েই পরমপদপ্রাপ্ত হতে চান এবং শিল্পী ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অন্তঃস্থিত ভাবনার স্বরূপ চিহ্নিত করে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে চান। কথায় আছে সঠিক সাধনা ও ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরের খোঁজ পাওয়া যায়। সাধু যেমন নির্জনে একা চোখ বন্ধ করে শুধু ঈশ্বরে মনোনিবেশ করে তেমনি শিল্পীর ধ্যান তাঁর শিল্পকর্ম সৃষ্টির মধ্যে যা মূলত অসীমের উদ্দেশে নিবেদিত। কেননা সৃষ্টিতে গভীর মগ্ন হয়ে গেলে তখন তা আর নিজের মধ্যে বাঁধা থাকে না, এমনকি কাছের মানুষগুলোও গৌণ হয়ে যায়, রসিকজন বলতে তখন একজনই থাকে। শিল্পের রস সাধারণ রসিক ছেড়ে অসীমের দিকে ধাবিত হতে থাকে, সেই যাত্রা পরমপানে ধাবিত হয়; কখনও সেখানে পৌঁছায় কখনও পৌঁছায় না। তাই তো শিল্পী কখনও তার নিজের সৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত হয় না। পরিতৃপ্তি মানেই সৃষ্টির শেষ। এই অপরিপূর্ণতাই শিল্পীকে নতুন কাজে প্রতিনিয়ত উৎসাহ যোগাতে থাকে। তবে কিছুটা তৃপ্ততার স্বাদ লাভ করেন যখন সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের সাথে তাঁর একটি বায়বীয় যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেই শিল্পকর্মের দ্বারা যা সত্য, মঙ্গলময় ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর। "এসথেটিকস কখনও 'Science of Aesthetic Pleasure' হয়ে আনন্দরসচর্বণার তত্ত্বানুসন্ধান করে, কখনো 'Science of Art' হয়ে সংগীত-নৃত্য-চিত্র-কাব্যাদি তাবৎ বিভিন্ন উপাদান নির্মিত কলাবস্তুর স্বরূপ আলোচনা করে। আবার কখনো 'Science of Beauty' হয়ে বাহ্যবস্তুর সৌন্দর্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করে।"(রহমান, ১ম, ২০১৪: ১৫২)

সংগীতের প্রতি ভালোলাগা নেই এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। যেকোনো বিষয়ের প্রতি বিভিন্ন কারণে ভালোলাগা কাজ করে। ভালো লাগার প্রাথমিক তিনটি কারণ থাকতে পারে-

১. চোখে ভালো লাগা
২. মনে ভালো লাগা
৩. বুদ্ধিতে ভালো লাগা (রহমান, ২য়, ২০১৪: ৪৩)

তবে যেভাবেই ভালো লাগুক না কেন মূলে সকলেই সুন্দরের পূজারী। সুন্দরের বিশ্লেষণ নিয়ে আধুনিক যুগে আরো মতভেদ তৈরি হয়েছে। অনেকেই বলেছেন সুন্দরের স্থান বস্তুতে নয়, মানুষের মনে। মানুষের মনের সৌন্দর্যানুভূতির প্রতিরূপ বাইরে ধরে রাখার যে চেষ্টা সেটাই সৌন্দর্যবোধ। অকারণের সুন্দর হল নান্দনিকতা। মানুষের কাছে কোনো কিছু তখনই সুন্দর বলে মনে হয়, যদি সেটি মানুষের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অন্তরে যে সৌন্দর্যবোধটুকু আছে তার সঙ্গে মিলিত হয়।

সৌন্দর্যশাস্ত্র আধুনিক যেহেতু এটি চলমান এবং ক্রমবর্ধমান। ক্রমশ যেমন এর বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হচ্ছে তেমন এর রূপ ও ব্যাখ্যাও অনেকে নতুনভাবে দিচ্ছেন। সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় আর্ট বা শিল্পকে কেন্দ্র করে। সৌন্দর্যশাস্ত্র চলমান হওয়ার প্রধান কারণ

হল কল্পনা। তবে সব কল্পনাই কিন্তু শিল্পের সৃষ্টি করে না। নতুন কিছু সৃষ্টির স্পৃহা থেকে যে কল্পনার উদ্রেক হয়, তাকে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই শিল্পের সৃষ্টি হয়। শিল্পের প্রকাশের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হল নন্দনতত্ত্ব। শিল্প যে সৌন্দর্যে সৌন্দর্যায়িত হয় সেটাই নান্দনিকতা। চলমান শব্দের আভিধানিক অর্থ গতি, গতির সঙ্গে যোগ হয় ছন্দ। নান্দনিক শব্দটির সঙ্গে ছন্দের একটা গভীর যোগ আছে। সেটি কাঠ বা পাথরের তৈরি কোনো শিল্পকর্মই হোক বা সুর-বাণীর মেলবন্ধনের কোনো সংগীত হোক অথবা গভীর ভাবাবেগ যুক্ত কথামালার কাব্যই হোক, প্রত্যেক বিষয়েই একটা ছন্দের উপলব্ধি পাওয়া যায়। "নান্দনিক বিচারে সুন্দর বস্তুর পরিচয় হচ্ছে তার উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্যটি। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যের কোন লক্ষ্য নেই, বা নিজস্ব চরিত্র সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। আনন্দের উদ্দেশ্য যেমন আনন্দ, সৌন্দর্যের তেমনি সৌন্দর্য"। (ইসলাম, ২০০৬: ৪৩)

সাধারণত মানুষের ভেতর দুই ধরনের বৃত্তি রয়েছে। ১. বুদ্ধিবৃত্তি ও ২. কল্পনাবৃত্তি। উভয় বৃত্তিই নতুন কিছু আবিষ্কারের পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বুদ্ধিবৃত্তির কারণে আবিষ্কৃত বিষয়বস্তু মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন চলার পথ মসৃণ করতে সাহায্য করে আর কল্পনাবৃত্তির কারণে সৃজনশীল মনের চর্চা হয়, যার কারণে মনের চাহিদা মিটাতে নতুন কিছুর সৃষ্টি হয় এরং তার সাহায্যে আশেপাশের সবকিছু সুন্দর হয়ে ওঠে। সুন্দর বলেই সে সুন্দর, এর আলাদা ব্যাখ্যা করার কিছু নেই; স্থান, কাল, পাত্রভেদে দৃষ্টিভঙ্গিই সৌন্দর্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করে। শাস্ত্রীয় সংগীতের সৌন্দর্যের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল (২০০৬)। *নন্দনতত্ত্ব*, সন্দেশ, ঢাকা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯২, সংস্করণ)। *সংগীত চিন্তা*, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫)। *গীতবিতান*, প্রতীক, ঢাকা।

রহমান, ড. এম মতিউর (২০১৪)। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব (১ম খণ্ড)*, অবসর, ঢাকা।

রহমান, ড. এম মতিউর (২০১৪)। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব (২য় খণ্ড)*, অবসর, ঢাকা।